হারানো শৈশবের চলচ্চিত্র

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রাক্ কথা :

প্রেট্রোলিয়াম কোম্পানি 'এসো' ১৯৬৪ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পরিচালকদের দিয়ে বেশ কিছু Short film তৈরি করান দূরদর্শনে দেখানোর উদ্দেশ্যে। সত্যজিৎ রায়কেও তাঁরা অনুরোধ করেন একটি নাতিদীর্ঘ ছবি ইংরেজি ভাষায় নির্মাণ করতে। সত্যজিৎ বাংলাভাষী চরিত্র নিয়ে ইংরাজি ভাষায় ছবি করতে আগ্রহ বোধ করেন না। তিনি একটি ১৫ মিনিটের নির্বাক ছবি - শুধু শব্দ ও সংগীতের ব্যবহারে করতে রাজি হ'ন। এই হ'ল **Two** ছবিটি নির্মাণের পূর্বকথা। ছবিটি ১৬ মি. মি. ফিল্ম -এ তোলা হয়। ছবিটির সংগীত, চিত্রনাট্য এবং পরিচালনা সত্যজিৎ রায়ের। চিত্রগ্রহণ সৌমেন্দু রায়, সম্পাদনা দুলাল দত্ত, দৃশ্য বংশী চন্দ্রগুপ্ত, ব্যবস্থাপনা অনিল চৌধুরী, আরও দু'জন কিশোর অভিনেতা।

আখ্যান :

Two ছবিটি দুটি কিশোরের একবেলার গল্প। দুটি ভিন্ন অর্থনীতিতে কিশোর দুটি বিরাজ করে। স্বভাবতই ভিন্ন দুটি সামাজিক অবস্থানও তাদের। এই দুটি কিশোরের সম্পর্ক থেকে সার্বিকভাবে সামাজিক ও মানসিক দুটি ভিন্ন অবস্থানের এক দ্বন্দ্ব উদ্‌ঘাটিত হয় এই ছবিতে। সে কারণে এই ছবিটি নিছক আর ছোটদের ছবির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এক বৃহৎ প্রেক্ষাপটে এই ছবি আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়।

ছোট ছবি। মেদহীন। সরাসরি বিষয়ের মধ্যে ঢুকে যান সত্যজিৎ। একটি ধনী পরিবারের কিশোর, তার বাবা - মা সকালে কাজে বেরিয়ে হাত নেড়ে তাদের বিদায় জানায়। গাড়িটি অপসৃয়মান। ফ্ল্যাটে একাকী কিশোর। হাতে একটি কোল্ডড্রিংক্‌সের বোতল। খায়, এঘর ওঘর ঘোরে, খাটে বসে। কিছু করার থাকে না। ইতিমধ্যে ঘরের দৃশ্যসজ্জা থেকে দর্শক বুঝে যায় আগের দিন ছেলেটির জন্মদিনের পার্টি হয়ে গেছে। সেখানে একটা দেশলাইয়ের বাক্স। সেটা তুলে নেয়। আনমনে দেশলাই জ্বালায়, নেভায়। একটা বেলুন দেশলাই জ্বেলে ফাটায়। আবারও একটা ফাটায়, উঠে পড়ে। তাকে রাখা অনেকগুলো দামী যান্ত্রিক খেলনা। একটা চালু করে। সেটা শব্দ করে বাজতে থাকে। আবার এগোয়। মেঝেতে ছোট ছোট ব্লক দিয়ে একটা মিনার সাজায়। সেটা দাঁড়িয়ে থাকে। এমন সময় সে একটা বাঁশির সুর শুনতে পায়। সে জানালায় আসে। দোতলার জানলা থেকে সে দেখে - ওরই বয়সী একটি দরিদ্র কিশোর বুনো আগাছা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বাঁশি বাজায় মনের আনন্দে। অপটু কিন্তু মিষ্টি সুর সে বাজিয়ে চলেছে। পিছনে একটি ঝুপড়ির চালাঘরের আভাস। বোঝা যায় সেও এখন একা। ধনী কিশোরটি যেন খেলার সঙ্গী পায়। সে ঘর থেকে তার দামী যান্ত্রিক বাঁশিটি নিয়ে এসে জানলার ধারে ছেলেটিকে লক্ষ্য করে বাজাতে থাকে। সেই বাঁশিতে কোনও সুর নেই, ধাতব আওয়াজ। তার ওই কর্কশ স্বরে কিশোরটির বাঁশির সুর চাপা পড়ে যায়। ঐ কিশোর বাঁশি থামিয়ে চলে যায় ঝুপড়ির পিছনে। নিয়ে আসে খেলনা ঢোল। বাজাতে থাকে উপরের কিশোরটিকে লক্ষ্য করে। ধনী কিশোরটিও খেলার মজা পায়। সে তার ঘর থেকে একটি যান্ত্রিক ঘেলনা নিয়ে আসে, যেটা ঝালাপালা শব্দে বাজতে থাকে, তাকে জানলায় রাখে। তার ওই উচ্চকোটি শব্দে ঢোল বাজানো দায়। সে আবারও ঝুপড়ির দিকে যায়— ফিরে আসে সারল্যমাখা এক মুখোশ পরে, হাতে ধনুক - সে নাচতে থাকে, খেলা জমে ওঠে। খেলা থেকে প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হয়। ধনী কিশোরটি এখন জয় চায়। সে বিকট মুখোষ পরে, মুখে দস্যুদের মতো গোঁফ আঁকে, হাতে খেলনা তীর ধনুক, বন্দুক। দ্রুত হৈ - হৈ -রৈ - রৈ কান্ড ঘটে। নানাভাবে ও দরিদ্র কিশোরটির খেলা সে পণ্ড করে দিতে চায় ; সফলও হয়। নাথা নীচু করে দরিদ্র কিশোরটি ফিরে যায়। ধনী কিশোরটির মুখে জয়ের হাসি। সে ফিরে আসে জানলা থেকে। আবারও সে একা। দেখে ওই কিশোরটি মনের খুশিতে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। ওর কোন ঘুড়ি নেই। রাগ হয়। এবার সে তার এয়ার গানটা নিয়ে এসে তাক করে ঘুড়িটায়। কিছু করতে সফলও হয়। কাটা ঘুড়ি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। দরিদ্র কিশোরটি বেদনাহত হয়। সে খেলতেই চেয়েছিল, জয়ী হতে নয়। ধনী কিশোরটির মুখে জয়ের হাসি। এখন সে আবার ঘরে আসে, রোবটটিকে মাটিতে নামায়, চালু করে। যান্ত্রিক শব্দে সে ঘরে হাঁটতে থাকে। মিনারের দিকে সে এগিয়ে আসে। এমন সময় সে আবারও শুনতে পায় সেই কিশোরের বাঁশির সুর, যেটা খোলা জানলা দিয়ে আকাশে ভাসতে থাকে। দরিদ্র কিশোরটিকে দেখা যায় না। শুধু তার সুর শোনা যায়। ধনী কিশোর বিছানায় বসে পড়ে। তার পরাজিত বেদনাহত মুখ জেগে থাকে। আর রোবটটি চলতে টলতে মিনারটা ভেঙে ফেলে। তখনও বেজে চলে বাঁশির সেই সুর।

গঠন :

সত্যজিতের সমস্ত শিল্পকর্মে যে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, এখানেও এই ছোট্ট ছবিতেও সেগুলি বিরাজমান। প্রয়োজনীয় ডিটেল, পরিমিত বোধ, আর জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। সত্যজিতের ছবিতে underline করে কোনও statement থাকে না। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দেই ছবির আত্মা পরিস্ফুটিত হয়। প্রতিটি shot -ই তাৎপর্যপূর্ণ। কোথাও কোন আলাদা করে চমক নেই। বহতা নদীর মতো তার গতি। এখানে কিছু উদাহরণ দিলে ভ্যাপারটা পরিষ্কার হয়। বাবা - মা গাড়ি করে বেরিয়ে যাবার পর বারান্দা থেকে সে ঘরে ঢোকে। কোল্ডড্রিংক্‌সের বোতলে চুমুক দেয়। বিছানায় শোয়। ঘরের সিলিং-এ দেখা যায় জন্মদিনের সাজানো পরিত্যক্ত বেলুন, রঙ্গিন কাগজ ঝুলছে। বোতলটি বিছানার পাশে টেবিলে রাখে। টেবিলে একটা দেশলাই বাক্স। বাক্সটি নেয়। সে এখন একা। কিছু করার নেই। খেলায়ে

দেশলাই জ্বালায়, নেভায়। এই অল্প সময়ে ছেলেটির আর্থিক - সামাজিক অবস্থা, পারিপার্শ্ব, একাকীত্ব সবটাই ফুটে ওঠে। ওই ১৯৬৪ সালেই সত্যজিৎ নির্মাণ করিছেলেন **চারুলতা** ছবিটি। কাকতালীয়াভাবে চারুর একাকীত্ব এবং এই কিশোরটির একাকীত্ব ভাবনাগতবাবে না হলেও বিষয়গতভাবে একটা প্রচ্ছন্ন মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নির্জন বাড়িতে দু'জনেরই কিছু করার নেই। এঘর ওঘর ঘুরে বেড়ানো আর জানলা দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে একটা সংযোগ স্থাপন।

যাই হোক, ঐ দেশলাই জ্বালানো নেভানোতে সে একটা খেলা পেয়ে যায়। হাতের কাছে বেলুন ছিল, দেশলাই কাঠি জ্বেলে সে বেলুন ফাটায় close shot -এ। এইখানে সাধারণ যেকোনও চলচ্চিত্রকার এই cutting point টা ধরে অন্য দৃশ্যে চলে যেতেন। এতে একটা নাটুকে দৃশ্যান্তর ঘটতো।

সত্যজিতের কোনও ছবিতে নাটুকেপনা থাকে না। নাটক থাকে। এই ছবিতেও সেটাই রয়েছে। জীবনের ছন্দে যেটুকু নাটক থাকে সেটাকেই তিনি ধরেন। ওই দুটি কিশোরের মধ্যে খেলার ছলে লড়াইতে যেটুকু নাটকীয়তা থাকে তা বাইরে বিষয়ে বা চলচ্চিত্রায়নে নাট্য সম্ভাবনা একেবারেই বর্জন করেন সত্যজিৎ। আর একটি দৃশ্যে - শেষের দিকে, ঐ রোবটটা চলতে চলতে ঐ মিনারটিকে যখন ধাক্কা মারে সেখানেও একটা নাটুকে দৃশ্যের অবতারণের সম্ভাবনা ছিল। সত্যজিৎ সে পথেই হাঁচলেন না। ছেলেটি পরাজিত অবস্থায় বিছানায় এসে বসলো। তারপর রোবট মিনারকে ধাক্কা দিল। যে কেউ এই দুটি ঘটনাকে একসঙ্গে ঘটাতেন, যা একটা নাট্য মুহূর্তের জন্ম দিত।

দুটি কিশোরের মধ্যে এতক্ষণ যে খেলারছলে লড়াই চলছিল সেখানে পর পর ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে। উড়ন্ত ঘুড়িটাকে গুলতি দিয়ে তাক করে যখন ধনী কিশোর বধ করতে পারে না, তার মুখে রাগ ফুটে ওঠে। সে জানালা থেকে ঘুরে দাঁড়ায় ঘরের দিকে। Shot-এ দৃশ্যটা ধরা হয়; Camera একটু এগিয়ে গিয়ে তার close -এ যায়। রাগ মুখ, সে কিছু একটা দেখছে। পরের shot। তার চোখ দিয়ে ওই mid shot - এই –দেওয়ালে ঠেসান দেওয়া একটা air gun। এখানেও camera একটু এগিয়ে তার close-এ যায়। Air Gun -এর ট্রিগার। পরের shot, সে জানলা দিয়ে ঘুড়িটাকে তাক করে। এতক্ষণ খেলা খেলা লড়াই চলছিল। এবার প্রকৃত যুদ্ধ। তাই camera-র এই চলন। ধনী কিশোরের ক্রুদ্ধ মুখ! ট্রিগার! শত্রুকে বধ করতে হবে যে! এরপর দরিদ্র কিশোরটির বেদনাকে ধরার জন্য সময়টাকে একটু বাড়িয়ে নেয় সত্যজিৎ। এখানে তিনি চারটি মোক্ষম shot ব্যাবহার করেন। দৃশ্যটিকে একটু প্রলম্বিত করা হয়। প্রথম Shot -এ আকাশে ঘুড়ি পাক খাচ্ছে, হঠাৎ গুলিবদ্ধ হয়ে ঘুড়িটি আকাশ থেকে খ'সে পড়ে। দ্বিতীয় shot, একটা পুরনো পাঁচিল পেরিয়ে ঘসটে ঘসটে কাটা ঘুড়িটা মাটিতে নামে। পরে mid shot-এ যে ঘুড়িটি এতক্ষণ পাখির মতো আকাশে ডানা মেলে উড়ছিল, ঘাসের জঙ্গলে যেন ছিন্ন ডানায় ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে এগিয়ে এসে একটা জায়গায় থেমে যায়। মৃত! পরের shot-এ ছেলেটির হাত ঘুড়িটা মাটি থেকে তোলে। Camera follow করে। ছেলেটি কাটা ঘুড়ি দেখছে। তার একটা অব্যর্থ close-up। ছেলেটির মুখে দুঃখ, বেদনা, রাগ আর ঘৃণা ডেগে ওঠে। কারণ সে খেলতেই চেয়েছিল –জয়ী হতে নয়। ওপ্রান্তে সেই কিশোরটির গোঁফ আঁকা মুখে জয়ের হাসি।

গোটা ছবিটায় দু'টি কিশোরের মধ্যে খেলার ছলে এতক্ষণ যে দ্বন্দ্ব চলছিল সেটা একেবারে শারীরিক পর্যায়ে। একেবারে শেষে, সব খেলার দ্বন্দ্ব যখন শেষ তখন শুধু সুরটাই ভেসে থাকে। ছবির শুরুর দিকে দরিদ্র কিশোরটি বাঁশিতে যে সুর তুলে খেলে বেড়াচ্ছিল সেই সুরটাই ধনী কিশোরটি শুনতে পায়। দর্শকও। এখন বিমর্ষ সেই কিশোর। এরপর কিশোরটিকে আর দেখানোর প্রয়োজন বোধ করেন না সত্যজিৎ। এতক্ষণের physicality থেকে ছবিটির এক উত্তরণ ঘটে। সব দ্বন্দ্বের পরেও সুরটাই জেগে থাকে। যা শাশ্বত!

বার্তা :

১৯৬৪ সালে সত্যজিৎ দুটি ভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থা দুটি কিশোরের মানসিক অবস্থাতে ধরেন যেখানে ধনী কিশোর খেলার ছলে জয় চেয়েছিল, পেয়েওছিল কিছুটা। কিন্তু শাশ্বত সেই সুরের কাছে তাকে পরাজিত হতে হয়। ফলত তার দুঃখবোধ জেগে ওঠে। আর আজ, মাল্টি স্টোরিড ফ্ল্যাট বাড়ির mono - culture-এ শৈশব আরও কত ভয়ানক হয়ে উঠছে। বিশাল বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ি, straightline –সব এক, কোথাও কোনও ব্যত্যয় নেই। উন্নয়নের ধাক্কা যেন শৈশবকে হাঁ করতে গিলতে আসছে! ঐ ধনী কিশোরটির একটা দুঃখবোধ ছিল। এখনকার শিশুদের সেই দুঃখবোধটুকুও থাকবে না। কারণ তার আশপাশ সব তারই মতো একাকী, বিচ্ছিন্ন, যান্ত্রিক। ১৯৬৭ সালে সত্যজিতের **প্রতিদ্বন্দ্বী** ছবিতে সিদ্ধার্থ (ধৃতিমান অভিনীত) তার শৈশবের হারিয়ে যাওয়া পাখির শিস্ শুনতে চেয়েছিল। আর ১৯৬৪ - তে তোলা এই **Two** ছবিতে দরিদ্র কিশোরটির বাঁশির সুর আমাদের বার বার মনে করিয়ে দেয় সভ্যতার কোন লগ্নে আমরা দাঁড়িয়ে আছি! প্রশ্নহীন জীবনে চিরায়ত জীবন সুরের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের এই ছবি। মহত্তম চলচ্চিত্র এভাবেই আমাদের নিভন্ত চেতনায় আঘাত করে।